রাত এখনও শেষ হয়নি

অভিষেক সেনগুপ্ত

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

প্রারম্ভ

বিষের স্বাদ কেমন, জানেন? টক, ঝাল, তেতো? নাকি মিষ্টি? বিষের স্বাদ কেমন, কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষের যন্ত্রণা? কিছুটা হলেও উপলব্ধী করি কখনও সখনও। বিষপান না করলেও তার জ্বালায় ছটফট করি অনেক সময়। সেই বিষ হয়তো জন্ম নেয় আমাদের ভেতরেই। কিংবা কেউ হয়তো খুব যত্ন করে আমাদের ভেতরে ঢেলে দেয় গরল। ধীর ধীরে ওই বিষ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। ছাড়খাড় করে দেয়। তখন আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। মৃত্যুই হয়ে ওঠে বিষের জ্বালা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

আচ্ছা থাক, বিষ নিয়ে বিশরকম ভণিতার দরকার নেই। চলুন, আমরা বরং সরাসরি চলে যাই ঘটনাস্থলে...

হলদিয়ার পাঁচতারা রিসর্টের স্পেশাল স্যুইটের বিশাল বেডরুমে জমে রয়েছে সাদা বরফের মতো নীরবতা। অ্যান্টিক দেয়ালঘড়ির কাঁটার মৃদু নড়াচড়া, ঘর বদলের স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এক-একটা মুহূর্ত পার করতে যেন দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে ঘড়িটার। এমন নীরবতার মধ্যেও উত্তপ্ত বাষ্পের মতো নিশ্বাস উগরে দিচ্ছে চারটে মেয়ে। নিস্তব্ধতার কপাট খুলে ভেসে আসছে হৃৎপিণ্ডের আবছা শব্দ। অসংখ্য পিংপং বল যেন ঘরের মেঝেতে একসঙ্গে গড়িয়ে দিয়েছে কেউ। তুমুল উত্তেজনায় তীব্রগতিতে ছুটছে চারজনের হৃৎপিণ্ড। যেন প্রবল উৎকণ্ঠায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে চারটে মেয়ে। নিশ্বাসের সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে আসছে হার্টবিট। হৃৎযন্ত্রের তীব্র উত্তেজনা ক্রমশ ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে স্পেশাল স্যুইটের নীরবতা।

স্যুইটের মাস্টার বেডটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটে মেয়ে। এদের কারোর সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি আমাদের। এই চারজন যেমন অচেনা, দুধসাদা বিছানায় এলোমেলো শুয়ে থাকা মেয়েটাকেও আমরা চিনি না। এদের চিনতে হলে আমাদের হাঁটতে হবে পেছনে। না হলে এই গল্পের অণু-পরমাণু, ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্ররা অধরাই থেকে যাবে। তার আগে, চোখ-কান খোলা রেখে এই মুহূর্তটাকে আরও কিছুক্ষণ জরিপ করা দরকার। রাত শেষ হতে এখনও ঢের বাকি। তাড়াহুড়ো না করে বরং চলুন, মাঝবয়সি রাতের পায়ে পায়ে হাঁটি। কেন? কিছু গল্প যে শুরুই হয় শেষ থেকে। অন্তিম পরিণতি জানা না থাকলে পুরো গল্পটা মেলানো কঠিন হয়ে যায়!

বিছানার একপাশে উলটে পড়ে রয়েছে একটা কফিমাগ। সেখান থেকে কফি গড়িয়ে গাঢ় কালচে তরল ছোপ ধরিয়েছে বিছানায়। যেন ছোপ ছোপ অন্ধকার ধরেছে বিছানায়। তার পাশে অবহেলায় পড়ে রয়েছে কালো, মোটা ফ্রেমের একটা চশমা। বহু ব্যবহারে জীর্ণ। হাতখানেক দূরে আলুথালু অবস্থায় পড়ে মেয়েটা। তার মুখের খানিকটা কাঁচা-পাকা চুলে ঘেরা। দেখে মনে হচ্ছে, পঞ্চাশের টোলট্যাক্সে এসে দাঁড়িছে বয়সের গাড়ি। পাক ধরা কয়েক মুঠো চুল সরালে দেখা

যাবে, কুঁচকে গিয়েছে চোখের কোণ। সেখানে জমা পড়েছে যন্ত্রণা। ক্ষীণ জলের ধারা চোখের কোণ বেয়ে চুলের অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তিরতির করে কাঁপছে গাল, চিবুক। দুই ভ্রু'র মাঝের ভাঁজ গভীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। এখনও নিশ্বাস পড়ছে ঠিকই, তবে কমে আসছে গতি। লম্বা শরীরটা সেই নিশ্বাসের তালেতালে ছোটো হয়ে আসছে। তীব্র যন্ত্রণায় ভেঙেচুরে যাচ্ছে তার ভেতরটা। তলপেট থেকে যেন একঝাঁক বিষাক্ত পিঁপড়ে উঠে আসছে বুকে। আঠায় চোবানো একদলা তুলো কেউ জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর শ্বাসনালিতে। ভীষণ চেষ্টা করছে, তবু নিশ্বাস নিতে পারছে না মেয়েটা। ও কি মারা যাচ্ছে?

মৃত্যু এক অদ্ভুত ক্ষণ। কারও সামনে যখন দরজা খুলে দাঁড়ায় মৃত্যু, সে বারবার জীবনের দিকে ফিরে যেতে চায়। অন্তত একবার যাবতীয় ভুল শুধরে নেওয়ার মরিয়া সুযোগ খোঁজে। দুধসাদা বিছানায় মিশে যেতে যেতে মেয়েটাও কি তা'ই চাইছে?

হাঁফাতে হাঁফাতে কোনোরকমে ঢোঁক গিলল সে। একদলা বাতাস টেনে বলে উঠল, "আ-আ-আমাকে... তো-ত-তোরা এত বড়ো শা-আ-আ-আ-স-তি..."

জড়িয়ে জড়িয়ে কোনোরকমে বলা কথাগুলো থেমে গেল মেয়েটার। গলা শুকিয়ে আসছে ওর। একটু আগেও বুকের ভেতরে নিশ্বাসের তুমুল গতি টের পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, একটা আস্ত টয়ট্রেন ঢুকে পড়েছে ওর মধ্যে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওটা বোধহয় দার্জিলিং থেকে ঘুমের দিকে রওনা দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটার মনে হচ্ছে, টয়ট্রেনটা থেমে গিয়েছে। আর কোনোদিন চলবে না। একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। দুটো হাত আর তুলতে পারছে না। অবশ হয়ে যাচ্ছে ঘাড়, মাথা। ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। এই ঘরের চার দেয়ালে লাগানো বেলজিয়ান লাইটসেট থেকে ছিটকে আসা এলইডি আলোটা যেন আরও হলদে হয়ে গিয়েছে। একরাশ ঘন অন্ধকার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ধীরে ধীরে এই স্যুইটের সমস্ত আলো গিলে ফেলবে ওই অন্ধকার। একটু একটু করে গ্রাস করবে ওই মুমূর্ষু মেয়েটাকেও।

হঠাৎই প্রচণ্ড ভয় পেল মেয়েটা। আতঙ্ক আর উদ্‌বেগের জোড়া ফলায় থরথর কেঁপে উঠল ওর শরীর। দুটো চোখ প্রাণপণে খোলার চেষ্টা করল। প্রদীপ নিভে যাওয়ার যেন আগে দপ করে জ্বলে উঠতে চাইছে! অনেকক্ষণ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটে মেয়ে। ওরাও বুঝতে পারছে, অন্তিম সময় হাজির হয়েছে। ওদের একজন ঝুঁকে পড়ল মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে যাওয়া মেয়েটার দিকে। বিছানায় বসে কোলে তুলে নিল তার মাথাটা। মুখের উপর পড়ে থাকা চুল সরিয়ে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিল কপালে। মুছিয়ে দিল দু'চোখের কোণ বেয়ে অবিরাম ঝরে পড়া জলের ধারা।

প্রায় নিশ্চল হয়ে আসা মেয়েটার নাম শ্রবণা। আবছা খসখসে ডুবে যাওয়া গলায় বলে উঠল, "ক্-ক-কী মিশিয়েছিস কফিতে, অঅঅর্ণা..."

যে মেয়েটা পরম যত্নে কোলে তুলে নিয়েছে বিছানায় শুয়ে থাকা শ্রবণার মাথা, তারই নাম অর্ণা। কোলে শুয়ে থাকা শ্রবণার করুণ আর্তি চোখ ভিজিয়ে দিচ্ছে অর্ণার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে। কান্না ভীষণ সংক্রামক।

অর্ণা আর ওর তিন সঙ্গীর চোখও ভিজে যাচ্ছে। নীরবে কাঁদছে চার বন্ধু। এমন কিছু ঘটুক তারা সত্যিই চায়নি। বাধ্য হয়েই বেছে নিতে হয়েছে এই পথ। এ ছাড়া তো আর উপায়ও ছিল না।

হাতের চেটো উলটে চোখের জল মুছে অর্ণা বলল, "অ্যাকোনাইট! মিঠে বিষ। তোর হার্টের কন্ডিশন যে ভালো নয়, জানি। তাই জাস্ট ফাইভ এমজি মিশিয়েছি তোর কফিতে। একটু সময় দে। দেখবি, আর কোনো কষ্ট হবে না তোর।"

স্যুইটের বাইরের পৃথিবীটা ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। একদলা কালচে মেঘ ধীরে ধীরে গিলে ফেলছে চাঁদটাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বৃষ্টি নামবে। তুমুল গতিতে এলোমেলো বইতে শুরু করেছে গঙ্গার ঝোড়ো হাওয়া। জানলা খোলা পেয়ে ওই ঠান্ডা বাতাস হু হু করে ঢুকে পড়ছে স্যুইটে। ওই ঠান্ডা হাওয়ায় শিথিল হয়ে আসছে অর্ণার কোলে শুয়ে থাকা শ্রবণার শরীর। কপাল, চোখ, নাকের গভীর দাগ মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। চির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে শ্রবণার মনে হল, আর কখনও বৃষ্টি দেখা হবে না, কখনও গঙ্গার ঝোড়ো হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারবে না, এই পৃথিবী আগের মতোই থাকবে; শুধু সে থাকবে না। ঘরময় ছুটে বেড়ানো দস্যি বাতাসে চোখ বুজে আসছে ওর। এত ঘুম জমে ছিল চোখে? কই, এতদিন তো বুঝতে পারেনি সে!

জড়ানো গলায় কিছু একটা বলার চেষ্টা করল শ্রবণা। অস্পষ্ট শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারল না ওর বন্ধুরা। ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অর্ণা ধরা গলায় বলল, "ভুলে যা, সব ভুলে যা। এই জীবন, তোর অতীত, তোর বর্তমান— সব ভুলে যা। সব কিছু থেকে তোকে মুক্তি দিল তোর এই চার বন্ধু। এটাই বোধহয় নিয়তি ছিল তোর। সব ভুলে যা। শান্তিতে ঘুমো।"

শ্রবণার নিভে আসা ঘোলাটে চোখে কি মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠল? সামান্য নড়ে উঠে শান্ত হয়ে গেল শ্রবণা। চিরকালের জন্য। তার পাশে বসে পড়ল বাকি তিন বন্ধু। অর্ণার মতো চোখের জলে ভাসছে তিন বন্ধুও। অবিরাম ঝরে যাওয়া চোখের জলে ধুয়ে নিতে চাইছে তাদের পাপ।

অধিকাংশ মানুষের জীবনের স্ক্রিপ্ট বড্ড চেনা ছকে এগোয়। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝের পথটুকু লড়াই করতে করতে বিভিন্ন মোড়, বাঁক, ঘাত-প্রতিঘাত পার করে তারা। বেঁচে থাকার শর্ত বোধহয় এটাই। কিন্তু কেউ কেউ এই হিসেব উলটে দিতে চায়। যে শ্রবণা এইমাত্র মারা গেল, সে-ও কি তা'ই চেয়েছিল? নিজের শর্তে বাঁচতে চেয়েছিল? যদি তা'ই হবে, তাহলে চার বন্ধু কেন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল শ্রবণাকে?

মৃত্যু বড়ো শান্তির পর্ব। জীবন যে সুখ দিতে পারে না, মৃত্যু তা'ই দেয়। জীবনভর যে ছটফটানি বারবার ক্ষতবিক্ষত করে, নিমেষে সেসব থামিয়ে দেয় মৃত্যু। হলদিয়ার ফাইভ-স্টার রিসর্টের স্পেশাল স্যুইটে শ্রবণার মৃত্যু দেখতে দেখতে ঝাপটা মারছে প্রশ্ন— নিয়তিই কি টেনে এনেছিল ওকে? পরিকল্পনা করে কি খুন করা হল শ্রবণাকে?

পাঠক চলুন, গল্পের সিঁড়ি ধরে এবার গভীরে নামতে হবে আপনাকে। সাবধান, সিঁড়ি কিন্তু ভীষণ পিছল...

রিইউনিয়ন

আলোকময় পৃথিবীতে একা হাঁটার থেকে ভালো আমাকে অন্ধকার দুনিয়া দাও। শুধু আমার পাশে যেন এক বন্ধু থাকে!

বহু যুগ আগে হেলেন কেলার কয়েক ছত্রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বন্ধুত্বের আসল মানে! আলো না থাকলেও চলবে, বন্ধু থাকে যেন। জন্মের মাত্র উনিশ মাসের মাথায় হেলেনের মতো কেউ যদি দৃষ্টি আর শ্রবণশক্তি হারায়, তার কাছে বন্ধু মানে আলোই। বন্ধু একটা এমন শব্দ, যার শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, নির্ভরতা এমনকি এই আস্ত পৃথিবীটাও। নিজের সঙ্গে যখন থাকি আমরা, স্মৃতিতে ভিড় করে আবছা কিছু মুখ। হয়তো স্কুলে কিংবা কলেজে ফেলে এসেছি সেইসব মুখ। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি। পুরোনো স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, কলেজ গেটের সামনে অজান্তেই থমকে যায় পা। কেউ অথবা কয়েক জন হইহই করে ঘিরে ফেলে পুরোনো আমিটাকে।

অতীত ফিরে পাওয়ার জন্য হলদিয়ার একটা রিসর্টে রিইউনিয়নে এসেছে পাঁচ বন্ধু। প্রায় দু'যুগ পর আবার তারা এক বৃত্তে। রোশনি আচার্য, শ্রমণা সরকার, পারমিতা শ্রীবাস্তব, অর্ণা ভট্টাচার্য আর পৃথা চ্যাটার্জি। স্বপ্ন আর পেশাদার জীবনের দাবি অনেককে ছিন্ন করে দেয় তার মূল থেকে। চেনা পরিবেশ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, চেনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তৈরি হয় নিজস্ব আধার। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করার পর বিশ্বের নানা শহরে ছড়িয়ে গিয়েছে পাঁচ বন্ধু।

অর্ণা এখন ডালাসে থাকে। স্বামী, এক ছেলে নিয়ে তার ভরা সংসার। মার্কিনমুলুকে পনেরোটা বছর কাটিয়ে ভ্যাঙ্কুভারে থিতু পারমিতা। তার ফরাসি স্বামী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এক ছেলে ও এক মেয়ে পারমিতার। অঙ্কোলজিস্ট রোশনি দুবাইয়ে সেটল্‌ড। এক মেয়ে তার। মালদার চাঁচল থেকে বাবা-মা'কে নিয়ে চলে গিয়েছে দুবাইয়ে। দেশের সঙ্গে শেষ সুতোটুকুও ছিঁড়ে গিয়েছে রোশনির। পৃথা অনেকদিন প্যারিসে। হার্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে বেশ নাম করেছে। প্যারিসে একটা ক্লিনিক রয়েছে ওর। বিয়ে করেনি। অনাথ বাচ্চাদের একটা এনজিও-র সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে ও। তার অপ্রাপ্তির ছোট্ট ঘরটা ফুলের মতো শিশুরাই পূর্ণ করে রেখেছে। একমাত্র শ্রমণা বেরোতে চায়নি দেশের গণ্ডি ছেড়ে। সে এখন মুম্বইয়ে থাকে। জীবন অথবা পেশা— চাপ যতই থাকুক না কেন, বিয়ে তার-ও করা হয়নি।

দিনভর হইহুল্লোড় করে এখন গুছিয়ে বসেছে পাঁচ বন্ধু। হলদিয়ার এই ফাইভ-স্টার রিসর্টটা রাতের ছোঁয়ায় যেন আরও নীরব হয়ে গিয়েছে। স্পেশাল স্যুইটের বিশাল বেডটাতে আয়েশ করে বসে জরুরি কথা মনে করানোর ঢঙে অর্ণা বলল, "রাতটা কিন্তু আমাদের জেগে কাটানোর কথা, মনে আছে তো সবার?"

পারমিতা হইহই করে বলে উঠল, "আরে বাবা, মনে আছে। আমার তো মনে হয় না, আজ রাতে কেউ ঘুমোতে চাইবে। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে! আজ সারারাত হুল্লোড় হবে।"

এক-একজনের জীবনের সালোকসংশ্লেষ এক-এক নিয়মে হয়! স্বপ্ন আর উত্তরণের নেশায় ভেসে যেতে যেতে অতীত ভুলে যায় মানুষ। গত কুড়ি বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না পাঁচ বন্ধুর। কিন্তু বন্ধুত্ব এক অদ্ভুত ঠান্ডা আগুন। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো মনের কোনো এক কোণে মুখ লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ জেগে ওঠে কোনো একদিন। ছিঁড়ে যাওয়া অদৃশ্য সুতোগুলো তখন আপনা থেকেই জোড়া লেগে যায়। তাদের এই রিইউনিয়নের উদ্যোগটা ছিল পারমিতার। লিঙ্কডইনে ও-ই এক-এক করে খুঁজে বের করেছে সবাইকে। তারপর পাঁচ বন্ধু মিলে আউটিংয়ের এই প্ল্যান। অর্ণা যেটার নাম দিয়েছে 'অভিসার'!

হলদিয়ার এই ফাইভ-স্টার স্যুইটটা একেবারে গঙ্গার ধারে। ঘর থেকেই কুলকুল শব্দে নদীর চলন টের পাওয়া যাচ্ছে। তার বুকে ভাসছে আস্ত একটা মোহময়ী চাঁদ। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি রাত নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। তরুণী চাঁদের দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠল রোশনি—

জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি
মরি, মরি...

বড়ো মিষ্টি গলা ছিল রোশনির। ডাক্তারি পড়ার সময় প্রায় রাতেই আড্ডা চলত ওদের। ওই আড্ডায় রোশনি গাইত। মুগ্ধ হয়ে শুনত চার বন্ধু। বহু পেছনে ফেলে আসা সেই পুরোনো সুর যেন আবার খেলা করছে ওর গলায়। বেগুনি রঙের প্লাজোর ওপর সাদা স্লিভলেস টপ পরেছে রোশনি। পঁয়তাল্লিশের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ও। কিন্তু দেখে তিরিশের বেশি মনে হচ্ছে না। কোলের ওপর কুশন রেখে চোখ বুজে গাইছে রোশনি। তার গলার চড়াই-উৎরাইয়ে ওঠা-নামা করছে সুরের উষ্ণ স্রোত। যেন সমস্ত ধারা-উপধারা নিয়ে এই রাত-গঙ্গা ঢুকে পড়েছে গলায়। রোশনির গান ভুলিয়ে দিচ্ছে সময়। অতীত আর বর্তমানের দোলায় দুলছে পাঁচ বন্ধু।

রোশনির গান থামার পরও কিছুক্ষণ আবেশে ডুবে রইল সবাই। নীরবতা ভেঙে বলল পৃথা বলে উঠল, "মনে আছে অর্ণা, ফোর্থ ইয়ারে ফেস্টে পারফর্ম করেছিলাম আমরা পাঁচ জন?"

খিলখিল করে হেসে উঠল অর্ণা, "বাব্বাহ্, তা আবার মনে থাকবে না! শ্রমণা তো রাজিই হচ্ছিল না! অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করে স্টেজে তোলা হয়েছিল ওকে! উফ্, কী ঝক্কি!"

'আমার গলায় সুর নেই। তোরা জোর করেছিলিস বলে গাইতে হয়েছিল!" নিচু গলায় বলল শ্রমণা।

মাস্টার বেডটার এককোণে খানিকটা জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে ও।

শ্রমণা চাইল্ড স্পেশালিস্ট। মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত। ঠানেতে নিজের ক্লিনিকও আছে। বাকি চার বন্ধুর মতো তার পসার ততটা জমেনি। পঁয়তাল্লিশেই অনেকটা বুড়িয়ে গিয়েছে শ্রমণা। কানের দু'পাশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সিলভারলাইন। চোখের কোণে, নাকের দু'পাশে রিঙ্কলস্। সমানুপাতিক গাম্ভীর্য, মোটা, কালো ফ্রেমের চশমাটা যেন শ্রমণার বয়স আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

"শোনো মেয়ের কথা! ওর গলায় নাকি সুর নেই? আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গান তুই-ই করতিস! আমরা ভুলে গিয়েছি নাকি? বল, তোরাই বল!" পারমিতা কপট রাগ করে বলল।

"গাইতাম হয়তো কখনও। কিন্তু সময় অনেক কিছু কেড়ে নেয় রে! বোধহয় সবটাই!" অস্ফুটে বলল শ্রমণা।

"তুই থাম", শ্রমণাকে থামিয়ে পৃথা বলে উঠল, "মনে আছে, রাত জেগে হস্টেলে যখন পড়াশোনা করতাম আমরা, শ্রমণাকে ধরতাম, গান শোনানোর জন্য। ওর গলায় নাকি সুর নেই! তোকেও গাইতে হবে কিন্তু। যাই বল না কেন, আজ তোর মুক্তি নেই। তার আগে আমি একটা গান শোনাই তোদের।"

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাইনি তোমারে—

ভেজা গলায় গাইছে পৃথা। যেন দুঃখ ঢেলে দিচ্ছে গানের কথায়, সুরে। ওই মূর্ছনার ককটেল মায়াজাল তৈরি করেছে রিসর্টের ঘরে। আলো-আঁধারির মধ্যে খেলা করছে সুর, লয়। গানের খুব গভীরে যেন বাজছে কোনো এক না-শোনা গান। বিভোর হয়ে ডুবে গেল ওরা পাঁচ জন। মুগ্ধ চোখে পৃথাকে দেখছে শ্রমণা।

"অনেক বছর তো দেশের বাইরে আছিস। তবু কি চমৎকার গাইলি রে!" পৃথার গান শেষ হতে বলে উঠল অর্ণা।

"সংস্কার, শিক্ষা কি কেউ ভোলে রে? দেশ, কাল, সমাজ, অভ্যেস পালটে গেলেও মানুষের ভেতরটা একই রকম থেকে যায়। সত্যি কী জানিস, আমি নিজেকে বদলাতে চাইনি কখনও। আমি যেমন, তেমনই থেকেছি। এভাবেই থাকব।" আবেগ জড়ানো গলায় বলল পৃথা।

পাঁচ বন্ধুর মধ্যে পৃথাই সবচেয়ে সুন্দরী। মেডিকেল কলেজে পৃথার পেছনে লাইন লেগে থাকত ছেলেদের। কেউ না কেউ রোজ ওকে প্রেমপত্র দিত। সেসব লাভলেটার ওরা সবাই মিলে মজা করে পড়ত। এখনও পৃথার রূপ একই রকম— শান্ত আর স্নিগ্ধ। পৃথা বরাবরই একটু চুপচাপ। চাপা স্বভাবের। কম কথা বলত। এত বছর পরেও ও থেকে গিয়েছে আগের মতো। সত্যিই মানুষের বেসিক কখনও বদলায় না!

গল্পের এই এক গুণ। কখন যে সে বন্ধু হয়ে যায়, বুঝতেই পারি না। আর তখন, গল্প নামক বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সব ভুলে যাই আমরা। এমনকি

কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনাও। এই দেখুন না, কুড়ি বছর পর পাঁচটা মেয়ের রিইউনিয়নে এতটাই বিভোর হয়ে গিয়েছি যে, একজনের কথা ভুলেই গিয়েছি। এই গল্প রিওয়াইন্ড করে তো শ্রবণার খুনের কারণ খুঁজতে শুরু করেছিলাম আমরা। কিন্তু পাঁচজনের ভিড়ে, আড্ডায় এতটাই মজে গিয়েছি যে, একটা পয়েন্ট মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে! পাঁচবন্ধুর ভিড়ে শ্রবণাকে তো দেখছি না! তবে কি ছ'জন এসেছিল রিইউনিয়নে? শুরুতে নয়, পরে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিয়েছিল শ্রবণা? একটা অভিশপ্ত রাত যে তার জীবনে নেমে আসতে চলেছে, আঁচ পেয়েছিল শ্রবণা?

গেম অফ ট্রুথ

আমাদের জীবন অসংখ্য ম্যাচ দিয়ে ঘেরা। কোনোটা হারি, কোনোটা জিতি। হারতে হারতে শিখি, জিততে জিততে এগোই। এই হার আর জয়ের মাঝেই লুকিয়ে থাকে অংসখ্য অজানা গল্প। সেই গল্প আমরা খুব গোপনে রেখে দিই। কারণ, জীবনের যা কিছু গোপন, তা তো আর সবার সঙ্গে শেয়ার করা যায় না। বলা যায় শুধু তাদের, যারা জাজমেন্টাল হবে না, বরং সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চাইবে, কিছু গল্প কেন এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। সেটা পারে একমাত্র বন্ধুরাই। হয়তো তাই যে কোনো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের এই বৃত্তই এখন আচ্ছন্ন রেখেছে আমাদের। পৃথা, অর্ণার গানে ভেসে যাচ্ছে হলদিয়ায় গঙ্গার ধারের ফাইভ-স্টার রিসর্ট। স্পেশাল স্যুইটটা যেন কুড়ি বছর আগের ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের হস্টেলের কোনো একটা রুম হয়ে গিয়েছে। কুড়ি বছর পর পাঁচটা মেয়ের হাসি-গল্পে যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে আবার।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই রোশনি গেয়ে উঠল—

সখি, ভাবনা কাহারে বলে
সখি, যাতনা কাহারে বলে...

প্রতিটা শব্দে যেন আবেগ ঢেলে দিচ্ছে রোশনি। পুরোনো বাড়ির পলেস্তারার মতো খসে খসে পড়ছে বর্তমান। যেন এই মুহূর্তের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা মেয়ে, কুড়ি বছর আগের যে রোশনিকে চিনত বন্ধুরা।

হলুদ পাতার মতো অতীতের দিনগুলো ওদের ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে মেডিকেল কলেজ, কমনরুম, হোস্টেল। কর্মব্যস্ত জীবন পেছনে ফেলে দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা পাঁচজন। একসঙ্গে কাটানোর জন্য শুধু একটা রাত ওদের হাতে। দুপুরে একে-একে এসে উঠেছে হলদিয়ার এই পাঁচতারা রিসর্টে। তারপর থেকে সময় পেরিয়ে চলেছে বাঁধভাঙা নদীর মতো, হু হু করে। সন্ধেটা ওরা হইহই করে কাটিয়েছে গঙ্গাবক্ষে, নৌকায়। সঙ্গমের দিকে এগিয়ে যাওয়া স্রোত ফিরিয়ে দিয়েছে পুরোনো দিনগুলো। সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় ওরা ফিরে পেয়েছে পুরোনো সম্পর্কের মৌতাত। এত কথা, এত গল্প জমে ছিল? হবে না-ই বা কেন? কুড়িটা বছর তো কম নয়! পাঁচ বন্ধু প্রাণপণে মুঠোয় চেপে ধরতে চাইছে সময়ের গা থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে যাওয়া বালি! সময় বড়ো নিষ্ঠুর। কেন যে দ্রুত ফুরিয়ে যায়! সকাল হলেই ওদের ফিরতে হবে নিজেদের চেনা গণ্ডির পথে। রাতটুকুই তো প্রাপ্তি। কে জানে, এমন রাত আর কখনও মিলবে কি না!

রোশনির গানের রেশ ফুরোতে অর্ণা বলল, "মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় আমরা প্রায়ই অন্ত্যাক্ষরী খেলতাম। হবে নাকি আবার?"